নেত্রীত্ব ও নেতৃত্ব ।

এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল নবীজীর নামে নারী-বিরোধী পিছলামী খেলগুলোর আর একটা প্রমান দেয়া। নারী-নেত্রীত্বের বিরুদ্ধে এই পিছলামি ফতোয়াটা ভেঙ্গে চুরমার করে আমাদের মা-বোনেরা সামনে এগিয়ে গেছেন, নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

ধর্মের কল নড়তে বাতাস লাগে, কিন্তু অধর্মের কল নড়ে বিনা বাতাসেই। বিশেষ করে রাজনৈতিক ইসলামের কল। সেই চাণক্যের ক্ষুরে ক্ষুরে সালাম যিনি বলে গেছেন, দশচক্রে ভগবান ভুত। ভগবানকে ধূর্ত পরিকল্পনামাফিক "এর মানে ওই আর ওর মানে তাই" বলে দশবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে দিলে ভুত বলে প্রমাণ করা সম্ভব। ওদিকে কিন্তু ভুতের পক্ষেও ভগবানের চেহারা নিয়ে সুপারগ্লু লাগিয়ে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসা সম্ভব। শিক্ষাটা হল এই যে, দড়িকে সাপ বা ভগবানকে ভুত মনে করলে কিছু ল্যাঠা হতে পারে, কিন্তু জানমালের তেমন কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সাপকে দড়ি বা ভুতকে ভগবান মনে করে নিশ্চিন্ত হলেই একেবারে সাড়ে সর্বনাশ।

ইসলামের ইতিহাসে এমনই এক সাড়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন এক সাহাবী। হাদিসটায় যাবার আগে ইতিহাসের সমুদ্র-মন্থন না হোক, নাটোরের মায়াময় জলটংগী দীঘির কাকচক্ষু পানি মন্থন করা যাক একটু। তারপরে যাওয়া যাক ইতিহাসের কাছে। ইতিহাস জিনিসটা হরি-কোবরেজের নামবিহীন রহস্যময় মিক্সচারের মত। বেজায় বিস্বাদ, কিন্তু অসুখ-বিসুখে কাজে দেয় বেশ।

ওই যে, জনান্তিকে নড়ে উঠছে ইতিহাস, ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে তার পাতা। ওই যে, নড়ে উঠছে সুদুর অতীতের কিছু ছায়া ছায়া মানুষ, ছায়াগুলো যেন কায়া হয়ে ফুটে উঠছে এখন। কান পাতলে ওদের কথা বার্তাও যেন শোনা যায় একটু একটু। রহস্যময় কোরাণ-হাদিস-শারিয়া, আলো-অন্ধকারের রাজা-রাণী, ইসলাম-মুসলিম, মোল্লা-মওলানা। রহস্যময় মিসর, ইয়েমেন, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া। একটু যেন চেনা যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ ওই যে ১২৩৬ সালের দিল্লী। সৈন্য -সামন্ত ঘেরা জৌলুসময় রত্ন-মাণিক খচিত রাজ-পোষাকে, হেমকুন্ডল মণিময় স্বর্ণ-মুকুটে তাজে, কেয়ূর কটিবন্ধ কনকহারে সজ্জিতা, সুসজ্জিত রাজ-অশ্বে চড়ে উন্নতশির চলেছেন মানুষের ইতিহাসের একমাত্র অবিবাহিতা সম্রাজ্ঞী, অষ্টাদশী সুন্দরী সুলতানা রাজিয়া। ছোট কোন জমিদারী নয়, সুবিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র মাল্‌কিন, সুলতান ইলতুৎমিসের একমাত্র কন্যা। ক্রীতদাসত্ব থেকে উঠে এসে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট হয়েছিলেন যিনি, দু'এক বছর নয়, সুদীর্ঘ ২৬ বছর একটানা রাজত্ব করেছিলেন যিনি, সেই ইলতুৎমিসের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি নিশ্চয়ই প্রশ্নাতীত। আঠারো বছরের কন্যার হাতে সুবিশাল রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানী। পুত্র ছিলনা ইলতুৎমিসের? ছিল, একজনের বেশী-ই ছিল। কিন্তু, "আমার ছেলেদের চেয়ে রাজিয়া বেশী উপযুক্ত" - বলেছেন সেই প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ পিতা। নিশ্চিত জানতেন, বেকুব নেতৃত্বের চেয়ে বুদ্ধিমতী নেত্রীত্বেই রাষ্ট্র-সমাজের মঙ্গল।

তা না হয় হল। হাজার হলেও বাপের মন, অতিস্নেহে ভুল অনেক বাপেই করেছেন দুনিয়ায়। কিন্তু আল্‌ মুস্তানসির (১২২৬ - ১২৪২), সেই সময়ের মুসলিম জাহানের আব্বাসীয় ৩৬ তম খলীফা? তিনি তো আর রাজিয়ার বাপ নন, তিনিও কি ভুল করেছেন? হৈ হৈ করে রাজিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাকে বরখাস্ত করে সহি বোখারি পালন করেছেন? না কি সমর্থন করেছেন? প্রমাণ আছে বাড়ীর পাশে কোলকাতায়। চলে যান তার মিউজিয়ামে। ছোট্ট এক মুদ্রা রাখা আছে সেখানে, সুলতানা রাজিয়ার সার্বভৌম রাজত্বকালে চালু মুদ্রা। পড়ে নিন সুলতানা রাজিয়ার নিজস্ব মুদ্রার ওপরে খোদাই করাঃ- "সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা মালিকা ইলতুৎমিস, যিনি আমিরুল মু'মেনিনের সম্মান বাড়ান"।

হল? এরই নাম ইতিহাস, বিন্দু বিন্দু সত্যের রাজকন্যা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কণাগুলো একসাথে মিলিয়ে নিলে বহু শতাব্দীর পরেও অশ্রুসিক্ত চোখে ফিসফিস করে কথা বলে ওঠে সে রাজকন্যা। আজকের বদ্ধবোধের অন্ধক্রোধের অন্ধকূপে বন্দী মুসলমানদের কিছু বলতে চায় বুঝি! অপরূপ কাহিনী শোনায় মিসরের, ইয়েমেনের, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার রাণীদের। রাজদন্ডধারী প্রবল রাজাদের অলংকার-মার্কা মোমের পুতুল রাণীরা নয়। রাজদন্ডধারিনী শাসনক্ষমতার অধিকারিনী রাণী, নিজের নামে মুদ্রা ছিল তাঁদের কারো কারো, তাঁদের নামে মওলানারা দোয়া করতেন মসজিদে মসজিদে।

কিছু নাম দেয়া হল।

১। ১২৩৬ সাল, দিল্লী। সুলতানা রাজিয়া।

২। ১২৫০ সাল, কায়রো। মসজিদ থেকে ভেসে আসছে খোৎবা, "দয়াবতী মুসলিম রাণীকে আল্লাহ রক্ষা করুন"। কে পড়াচ্ছেন সে খোৎবা? আর কে হতে পারে, মসজিদে মওলানাই পড়াচ্ছেন সেটা, সহি বোখারী যাঁর অবশ্যই জানা থাকার কথা। ।

৩। ইরাণের তুরকান অঞ্চলের রাণী তুরকান খাতুন, ১২৫৭ থেকে ১২৮২ পর্য্যন্ত একটানা ২৬ বছর। মসজিদে তাঁর নামে খোৎবা।

৪। তুরকান খাতুনের কন্যা পাদিশা খাতুন। নামাংকিত মুদ্রা।

৫। ইরাণের সিরাজ অঞ্চলে আব্‌শ খাতুন। ১২৬৩ থেকে ১২৮৭, একটানা পঁচিশ বছর। খোৎবা ও নামাংকিত মুদ্রা, দু'টোই।

৬। ইরানের লুরিস্থান অঞ্চলের ১৩৩৯ সালের মুসলিম রাণী, নাম জানা নেই।

৭। রাণী তিন্দু, ১৪১১ থেকে ১৪১৯ পর্য্যন্ত, নয় বছর। জায়গা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

৮, ৯ ও ১০। মালদ্বীপের সুলতানারা খাদীজা, মরিয়ম ও ফাতিমা। ১৩৪৭ থেকে ১৩৮৮, একটানা ৪১ বছর। এক সময়ে ইবনে বতুতা সেখানকার সরকারী কাজী ছিলেন।

১১ ও ১২। ইয়েমেনের সুলায়হি (শিয়া-খেলাফত?) বংশের দুই রাণী আসমা ও আরোয়া, প্রায় অর্ধ শতাব্দী। আসমার নামে খোৎবা।

হল? না কি আরও বলতে হবে উন্নতির কথা? আচ্ছা, একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :- "১৫৯১ হইতে ১৯২৫, প্রায় তিনশ' তিরিশ বছরে পুরুষ রাজারা দেশের রাস্তাঘাট দানালকোঠা মসজিদ-গম্বুজে যাহা উন্নতি করিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞী আসমা ও আরোয়া তাহা হইতে অনেক বেশী উন্নতি করিয়াছিলেন"। কত বছরে করিয়াছিলেন? মাত্র পঞ্চাশ বছরে। অর্থাৎ নেত্রীত্বের পঞ্চাশ বছরের কাছে পরাজিত হয়েছে নেতৃত্বের তিনশ' তিরিশ বছর। এঁরা মওলানাদের আর ইসলামী খলীফার সমর্থন পেয়েছেন এবং যথেষ্ট সাফল্যের সাথে শাসন করেছেন। এবারে আসা যাক সেই দুর্ধর্ষ হাদিসের শেকড়ে। নবীজি বলিয়াছেন। তা বেশ। শুনিয়া আমাদের সাহাবিটি "বড়ই উপকৃত" হইয়াছেন। তা বেশ। কিন্তু নবীজী কাহাকে এ হেন বিষাক্ত কথা বলিয়াছেন? কবে বলিয়াছেন? কোন পরিস্থিতিতে বলিয়াছেন?

যুদ্ধ-বিগ্রহে নবীজীর অসাধারণ সমর-প্রতিভা আর রণচাতুর্য্য ধরা আছে ইবনে হিশাম/ইশাক, আর তারিখ আল্ তাবারিতে। নবীজীর তায়েফ আক্রমনের সময় (৮ হিজিরীতে) কিছুতেই তায়েফের দুর্গ ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। তখন তিনি ঘোষনা করে দিলেন, দুর্গের ভেতর থেকে যে সব ক্রীতদাস পালিয়ে আসবে তারা সবাই মুক্ত হবে। শুনে অনেক ক্রীতদাস তায়েফ দুর্গ থেকে পালিয়ে আসে, চালাক বালক আবু বাকরা (হজরত আবু বকর নন) ছিলেন তাদের একজন। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর চলে গেছে, নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই চালাক ক্রীতদাস বালক শাম দেশে (আধুনিক ইরাক) বসরা নগরের প্রতিষ্ঠিত

গন্যমান্য নাগরিক হিসেবে উদয় হয়েছেন। এর পর ঘটে গেল মুসলমানের ইতিহাসে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের তিনটে রক্তাক্ত গণযুদ্ধের প্রথমটা। এ যুদ্ধ হয়েছিল হজরত ওসমান খুন হবার পরে বসরায়, হজরত আলীর বিরুদ্ধে হজরত আয়েশা-তালহা-যুবায়ের দলের। প্রাথমিক ইসলামের জীবন-মরণ যুদ্ধগুলোর সমরসঙ্গী এঁরা সবাই, অথচ এখন পরস্পরের রক্তপিপাসু! চিন্তা করা যায়! উট শব্দটার আরবী হল "জামাল"। বিবি আয়েশা উটে চড়ে হযরত আলীর বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করেছিলেন বলে এ যুদ্ধের নাম হয়েছে জামাল যুদ্ধ। সাহাবির হাতে এধারে ওধারে খুন হয়েছেন বারো হাজার সাহাবি এ যুদ্ধে।

মানব-ইতিহাসের পাঁচজন চির অপরাজিত সেনাপতির মধ্যে আলী একজন (নবীজী নিজে আরেকজন)। জামাল যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি বিবি আয়েশাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবার পর বসরায় প্রবেশ করে শহরের গন্যমান্য লোকদের ডেকে পাঠান। তখন আবু বাকরা আলীকে এই হাদিস শোনান। নবীজীর সময় ৬২৯ থেকে ৬৩২ সাল পর্য্যন্ত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আক্রমনে পারস্যে খুব বিশৃংখলা গেছে। তখন সেখানে দু'জন নেত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল, সে কথা শুনে নবীজী নাকি আবু বাকরাকে এ হাদিস বলেছিলেন। উদ্ধৃতিঃ- "আবু বাকরা বলিয়াছেন, জামাল যুদ্ধের সময় আমি সাহাবীদের সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধে প্রায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু নবী (দঃ)-এর একটি কথায় আল্লাহ আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। যখন নবীজীকে (দঃ) বলা হইল যে (পারস্যসম্রাট) খসরুর মৃত্যুর পরে পারস্যের লোকেরা তাহার কন্যার উপর নেত্রীত্ব অর্পন করিয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, -" কখনও উন্নতি করিবে না সেই জাতি যে জাতি তাহাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে নারীর উপরে"। - সহি বোখারীর ইংরেজী অনুবাদ, পঞ্চম খন্ড, হাদিস নম্বর ৭০৯, ডঃ মহসিন খান, মদিনা বিশ্ববদ্যালয়। এটা বোখারীর যে কোন বাংলা অনুবাদে পেয়ে যাবেন, হাফেজ মোঃ আবদুল জলিলের ৯০ পৃষ্ঠার ২২২ নম্বরে তো পাবেনই, আজিজুল হক সাহেবের বোখারীর চতুর্থ খন্ডের ২২৬ পৃষ্ঠাতেও পাবেন হয়ত। ওগুলো অবশ্য একটু সংক্ষেপ করা আছে, কেন কে জানে।

অর্থাৎ যুদ্ধে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলার বিপজ্জনক মুহুর্তে তাঁর হঠাৎ এ হাদিস মনে পড়েছে, সুদীর্ঘ পঁ-চি-শ ব-ছ-র পর! যুদ্ধের বিপদ থেকে চাচা আপন পরাণ বাঁচা বোধহয়। এবার

১। এ হাদিস আবু বাকরা প্রকাশ করেছেন জামাল যুদ্ধে হজরত আয়েশা পরাজিত হবার পরে, আগে নয়।
২। এ হাদিসের সম্মান রাখতে তিনি আলীর পক্ষে আয়েশার (নারী-নেত্রীত্বের) বিপক্ষে যুদ্ধে নামেন নি।
৩। বলেছেন নবীজীর মৃত্যুর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, তার আগে একবার-ও বলেন নি।
৪। এ হাদিসে তিনি বড়ই উপকৃত হয়েছেন বলে জানান।
৫। তিনি হজরত আলীকে বলেছেন, তিনি নাকি হজরত আয়েশাকে জামাল যুদ্ধের আগে চিঠি লিখে এ হাদিসের কথা জানিয়েছিলেন। (অর্থাৎ হাদিসের সুত্রে তাঁকে নেত্রীত্ব ছাড়তে বলেছিলেন)।
৬। অনেক গুরুত্বপুর্ণ হাদিস নবীজী বর্ণনা করেছেন অনেক সাহাবীকে, কিন্তু যে হাদিসের সাথে বিশ্ব-মুসলিম নারীদের সম্পর্ক কেয়ামত পর্য্যন্ত বাঁধা, সেই অসাধারণ গুরুত্বপুর্ণ হাদিস নবীজী বলেছেন শুধুমাত্র তাঁকে-ই, আর কোন সাহাবীকেই নয়, বিদায় হজ্জের খোৎবাতেও নয়।

এবার একটু অংক করা যাক। এ বড় সহজ অংক, দু'য়ে দু'য়ে চার।

১। "আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি"। কিভাবে? আবু বাকরা কোন রাজা বাদশা ছিলেন না, কিভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বড়ই উপকৃত হলেন? প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আলীর পক্ষেও যোগ দেন নি।

২। জামাল যুদ্ধে যদি আয়েশা জিতে যেতেন, তবে কি তিনি এ হাদিস প্রকাশ করতেন? কে জানে!!

৩। জামাল যুদ্ধ না হলে এ হাদিস তিনি বলতেন কি? বোধ হয় না, কারণ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে এ হাদিস বলা হয়নি।

এবারে প্রমাণ।

১। তাঁর চিঠিতে নবীজীর এ কথা জানার পরেও বিবি আয়েশা নেত্রীত্ব ছেড়ে দেন নি, রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মরণ যুদ্ধের নেত্রীত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এ হাদিস বিশ্বাস করেন নি।

২। মওলানারা এ হাদিস জানতেন না, এটা হতে পারে না। যুগে যুগে মুসলিম রাণীদের সময় কোন মওলানা একবারও এ হাদিসের ভিত্তিতে রাণীদের বিরোধীতা করেন নি। অর্থাৎ তাঁরা এ হাদিস বিশ্বাস করেন নি।

৩। মুসলিম জাহানের খলীফাদের দরবারে কোরান-হাদিসের প্রচন্ড চর্চা হত। এ হাদিস নিশ্চয়ই তারা জানতেন। মুসলিম জাহানের খলীফা আল মুস্তানসিরও এ হাদিস বিশ্বাস করেন নি।

অর্থাৎ ইসলামের ইতিহাসে কেউই এ হাদিস বিশ্বাস করেন নি। আমাদের শর্ষে জাতিয় পীরেরা মাঝে মাঝে হেঁকে ওঠেন বটে, কিন্তু আইউবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নার সমর্থক মওলানা মৌদুদীও বিশ্বাস করে নি। কেন? কারণটা তাঁরা জানতেন। কি কারণ? মাত্র তিনটে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, আরও বহু জায়গায় পেয়ে যাবেনঃ-

সুত্র -১। এই হাদিসের অসত্যতা সুপ্রমাণিত শুধু ইতিহাসেই নয়, বরং ইহাও সত্য যে আবু বাকরা সম্বন্ধে মুসলমানের ইতিহাসে দলিলবদ্ধ আছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে তাহাকে জনসমক্ষে শাস্তি দেয়া হইয়াছিল। - উইমেন'স রাইট ইন ইসলাম-শরীফ চৌধুরী।

সুত্র-২। নারী-নেত্রীত্বের সমর্থকগন এই হাদিস বিশ্বাস করেন না কারণ ইহার বর্ণনাকারী আবু বাকরাকে নারী-ব্যাভিচারের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে হজরত ওমর শাস্তি দিয়াছিলেন। - ইসলামী ওয়েবসাইট -উইমেন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইসলাম -www.submission.org/women/politics.html.

সুত্র ৩। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে আবু বাকরাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। - "দি ফরগটেন কুইনস্ অফ ইসলাম"- বিখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ফাতিমা মার্নিসি।

এইবার কোরান শরীফ খুলে সুরা ২৪-এর আয়াত ৪ দেখে নিন - "যাহারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ-সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে আশীটি বেত্রাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য কবুল করিবে না। ইহারাই না-ফরমান"।

বাচ্চার হাতে বাঁচে জাতির ভবিষ্যৎ আর মায়ের হাতে বাঁচে বাচ্চা। নিজেদের নারীদের একের পর এক এমন অপমান করে পঙ্গু করার পদক্ষেপ নিয়ে দুনিয়ার মুসলমানকে এক আত্মঘাতী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন আমাদের মওলানারা। যেহেতু হাদিসে আছে, সেহেতু ওটাকে সমর্থন করাটা দাঁড়িয়ে গেছে ইসলামের অঙ্গ, ইবাদতের অঙ্গ, - হাদিসটার মূলে না গিয়ে কত ভাবে কত গবেষণায় না খেয়ে না দেয়ে কতই না মাথা ঘামিয়ে "প্রমান" করার চেষ্টা হয়েছে যে নারীরা নেত্রীত্বের যোগ্য নয়। খুলে দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা কোরাণ, পৃষ্ঠা ৯৯৩:- "আলেমগন এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পন করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতের ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত"।

আরও দেখুন পৃষ্ঠা ১২২০:- "যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হইবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হইবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হইবে - তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করিবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভুপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভুগর্ভই শ্রেয়ঃ হইবে" - (রূহুল মা'আনি)। এমনকি বিশ্ব-বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত মওলানা ওয়াহেদ উদ্দিন, বিশ্ব-বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক-বক্তা, ক্যানাডার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবীণ আধ্যাপক ডঃ জামাল বাদাওয়ী পর্য্যন্ত নারী-নেত্রীত্বের বিরুদ্ধে নিবন্ধ লিখেছেন, এই হাদিসের ভিত্তিতেই সম্ভবতঃ। তাঁর শত শত নিবন্ধের মধ্যে ওটাই নাকি সবচেয়ে মশহুর।

লজ্জাটা কম নয়, কিন্তু সমস্যাটা তারও বড়।

এ কালনাগ এখন মৃতপ্রায়। কিন্তু এখনও আরও অনেক বাকি। এখনও বোনদের সমান উত্তরাধিকার পেতে হবে, বিয়ে-তালাকে সমান অধিকার পেতে হবে, জীবনের সিদ্ধান্ত-গ্রহনে সমান অধিকার পেতে হবে, সর্বক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও সম্মান পেতে হবে, দেশ পরিচালনায় ও দেশরক্ষায় সমান অধিকার পেতে হবে। বৌ-পেটানো চলবেনা, অনিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ চলবে না, স্বামীদের হঠাৎ তালাক দেবার অধিকার চলবে না, পয়সা দিয়ে (খুলা) স্ত্রীকে তালাক কিনতে হবে না, তালাকের ক্ষেত্রে সম্পত্তির সমান বন্টন হতে হবে, বাচ্চাদের ওপর সমান অধিকার থাকতে হবে (এগুলো সব পিছলামি খেল, পরে দেখাবার ইচ্ছে রইল)। তাঁদের জীবন মওলানাদের বাপের সম্পত্তি নয়, মওলানাদের খেলার পুতুল নন তাঁরা। হাজার বছর ধরে মা-বোনের আর্তনাদ তাদের কানে গেছে। মানবিকতা, যুক্তি আর নৈতিকতার দোহাই দিয়ে শত শত দার্শনিক প্রতিবাদ করেছেন। কাজ হয়নি, হবেও না। একমাত্র উপায় হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও আইন-গত প্রতিরোধ, আর রাজনীতি থেকে এদের বের করে দেয়া। সার্বিক ভাবে সামাজিক-বর্জন করে সামাজিক ঘৃণার পাত্র করতে হবে এদের, দুনিয়ার সর্বত্র।

কিন্তু তার পরেও শারীরিক সংঘর্ষ ছাড়া এ দানবকে কিছুতেই পরাস্ত করা যাবে না। স্যামুয়েল হান্টিংটনের দৈববাণী, ‘‘ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন’’ সম্ভবতঃ ঘটেই যাবে।

****

অষ্টাদশী কুমারী রাজিয়া অপরূপা সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁরও প্রাণঘাতী প্রেমের ফাঁদ পাতা ছিল ভুবনে। এক সুদর্শন ক্রীতদাস ছিল তাঁর ব্যক্তিগত প্রহরী, নামটা ভুলে গেছি। অতনু-শরবিদ্ধ হলেন দু’জনই, দেবলোকে নৃত্যছন্দে মনোহর পেখম মেলল প্রেমদেব কার্তিকের ময়ুর। কিন্তু ইশক্ ঔর মুশ্ক ছুপায়ী নেহি ছুপতে। প্রেম আর সুগন্ধ লুকিয়ে রাখা যায় না। কথা ছড়িয়ে পড়ল চুপিচুপি। একদিন দয়িতের প্রেমময় হাতে পা রেখে ঘোড়ায় চড়লেন সম্রাজ্ঞী, নিঃশব্দে নিষ্ঠুর অট্টহাসি হেসে উঠল নিয়তি। মওলানাদের কাছে প্রেম-ভালোবাসা জিনিসটা চিরকালই অশ্লীল, বেগানা পুরুষের স্পর্শের পুরো সুযোগ নিয়ে নিল মোল্লারা, ফতোয়া জারী হয়ে গেল। ক্ষমতার ষড়যন্ত্র চলছিলই, চারদিক থেকে বজ্র নেমে এল তরুণী রাণীর মাথায়। চিরকালের বিলাসী মেয়েটা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পালাতে বাধ্য হলেন। সাথে চির-অনুগত চিরসাথী সেই প্রেমিক ক্রীতদাস, প্রেমের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে রইল। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, পেছনে ধেয়ে আসা হায়েনার দল। অবশেষে দিল্লী থেকে বহুদূরে জঙ্গলের ভেতর এক পরিত্যক্ত কুটিরের দাওয়ায় ক্ষুধার্ত ক্লান্ত ঘুমন্ত রাজিয়াকে খুন করল সিংহাসনের সৈন্যরা, সুবিশাল সাম্রাজ্যের মাল্‌কিনের ধুলি ধুসরিত রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রইল অবহেলায়। আর সেই প্রেমিক? সে তো কবিগুরুর ‘‘কাব্যে উপেক্ষিতা’’। তার ইতিহাস, তার বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার ধরা নেই কোথাও। দিক দিগন্তরে যুগ যুগান্তরে কত শত অজানা ছোট বড় তাজমহলে অলংকৃত মানুষের ইতিহাস, কত রক্তাক্ত হৃদয়ের নিঃশব্দ আর্তনাদ! কেউ জানে না, কোথাও লিখে রাখা হয় না। কোথাও কি কোন মরমী লেখক নেই যিনি হীর-রাঞ্ঝার মত, শিরী-ফরহাদের মত, লায়লা-মজনুর মত, নদের চাঁদ-মহুয়ার মত সুলতানা রাজিয়ার এই অসাধারণ বেদনার্ত বাস্তব কাহিনীটাও লিখবেন?

****